মেয়েলি সংলাপ : মেয়েদের পৃথিবী — আশাপূর্ণা দেবীর কলমে

নির্মাল্য মণ্ডল
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
নিউ আলিপুর কলেজ
Email: 100nirmalya@gmail.com

সংক্ষিপ্তসার :

নারীর ভাষায় নারীর প্রতিবাদ এবং নারী কথাসাহিত্যিকের লেখায় তার নির্মাণ-শিল্প কিভাবে রূপ পায়— আলোচ্য নিবন্ধে আশাপূর্ণা দেবীর ছোটোগল্পকে কেন্দ্র করে তার ওপর আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে। সমাজ পরিবেশের মধ্যে মেয়েদের স্বাধীন আচরণের মতো স্বাধীন বাকশক্তির, আত্মপ্রকাশের ওপর নানাভাবে রাশ টানা হয়। সময়ের বদলে আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা মেয়েদের অবস্থা অনেক বদলেছে ঠিকই, কিন্তু এ যাবৎ চলে আসা বহুকালের সংস্কার মেয়েদের সংলাপে কোথাও একটি আবরণ গড়ে দেয়। ফলে পুরুষালি সংলাপের সঙ্গে মেয়েলি ভাষার তফাৎ সৃষ্টি হয়। তবু, নিজের কথা কি একেবারে বলতে ছাড়ে মেয়েরা? শুধু তার প্রকাশের ভঙ্গি হয় অন্যরকম। কখনও বা কোনও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় নিজস্ব বক্তব্যের উল্টো পথে হাঁটে মেয়েরা। এই সমাজ দীর্ঘকাল যাবৎ মেয়েদের স্বাধীন ইচ্ছে আচরণ ও বক্তব্যকে প্রকাশের সুযোগ দেয়নি। তাই সমাজের সঙ্গে এক ধরনের লুকোচুরি খেলায় মেয়েরা আবহমানকাল ধরে অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। সেই কারণেই নারীর নিজস্ব সংলাপে মিশে যায় তার সুদক্ষ অভিনয়। সেখানে ভেদ ঘটে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের, আত্মবিশ্বাসী অথবা দিশেহারা নারীর। সামাজিক অবস্থানভেদও নারীর সংলাপে প্রভাব ফেলে; এরই মধ্য দিয়ে কখনো তাদের আত্মস্থ ব্যক্তিত্বের বর্ণমালা ফুটে ওঠে, কখনও কৌতুক-শ্লেষের মাধ্যমে আত্মধিক্কার ও আত্মক্ষয়ের জ্বালাময় উচ্চারণ ঘটে। শরীরী ভাষাও নারীর সংলাপের একটি বড় জায়গা করে নিয়েছে। এইসবেরই বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকাশ ঘটে চলে— নারীর নিজস্ব ভুবনে, নারীর সংলাপের মাধ্যমে।

সূচক শব্দ :

মেয়েলি সংলাপ— পরিবেশ, প্রকৃতি, বৈচিত্র্য, মনস্তত্ত্ব।

মেয়েলি সংলাপ : মেয়েদের পৃথিবী — আশাপূর্ণা দেবীর কলমে

''প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে যেমন পুরুষ ও উচ্চবর্ণের মানুষেরা বলতেন অভিজাত সংস্কৃত ভাষা আর নারী ও নিম্নবর্গের জন্য বরাদ্দ ছিল অনভিজাত প্রাকৃত ভাষা, তেমন কোনো সচেতন নির্দেশের বশবর্তী হয়ে নয়, চারপাশের জীবন পরিবেশে যা ছিল একান্ত স্বাভাবিক, সেই স্বাভাবিকতার শর্ত মেনেই নারী ঔপন্যাসিকেরা মেয়েদের অন্দরের ভাষাকে নিয়ে এসেছিলেন উপন্যাসে, করে তুলেছিলেন তাদের মুখের ভাষা।

... নারী ও পুরুষের মুখের ভাষার এই যে ভিন্নতা, তা হয়তো গড়ে ওঠে তাদের জীবন-পরিবেশের এমন বিশিষ্টতার কারণেই। বহুকাল ধরে মেয়েরা যে গৃহকোণে বন্দিনী হয়ে থেকেছে শুধু সংসার পালন আর সন্তান ধারণের জন্য, সেই আবদ্ধতা আর কোণে-জড়ানো নানা সংস্কার মিশে গেছে তাদের মুখের ভাষাতেও। আধুনিক যুগের ভাষা বহন করে চলেছে সেই দীর্ঘাগত ঐতিহ্য,...”। (ঘোষ ৩০৮)

নারীর ভাষা নারী কথাসাহিত্যিকের লেখায়, কেমনভাবে রূপ পায়, নারীর আত্মপ্রকাশে সেই ভাষা কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ ও যথাযোগ্য হয়ে ওঠে— বিষয়টি সমাজ-বিশ্লেষকের কৌতূহলী আলোচনার বিষয়। আলোচ্য নিবন্ধেও মেয়েদের নিজস্ব সংলাপের মধ্যে দিয়ে নারীর সমাজ মানসিকতার সঙ্গে মানিয়ে চলা এবং না-চলার, আপস ও প্রতিবাদের স্বরূপকে চেনবার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে বিশশতকের অন্যতম নারী-কথাসাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবীর ছোটোগল্পকে।

আশাপূর্ণার গল্পের মেয়েরা চেনা চরিত্র হয়েও প্রায়শই অচেনা হয়ে ওঠে; অচেনা অংশটি সংবেদনশীল মানুষের গভীর নিরীক্ষার ফল। মেয়েদের সঠিকভাবে বুঝতে না চাওয়ার অথবা না পারার মধ্যে সমাজের কিছুটা অবহেলাজনিত মনোভাব কাজ করে। এই মনোভাবের অন্তরালে মেয়েরাও নিজেদের আড়াল করায় অভ্যস্ত। আসলে সংসারে ভারসাম্য রক্ষার খেলায় যে কোনও মেয়েই সহজাতভাবেই নিপুণ অভিনেত্রী; আর এই অভিনয় শিল্পের সঙ্গে তাল রেখেই মেয়েদের ভাষায় আচরণে প্রতিনিয়িত পরিবর্তন ঘটে। ‘দেশলাই বাক্স’ গল্পের নমিতার কথা ধরা যাক। সন্দেহবাতিক স্বামী, অভাবে স্বভাব নষ্ট হওয়া নিত্য প্রার্থী মা, ছিদ্রান্বেষী বড় জা— সবার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে প্রাণপণে মানিয়ে চললেও তার নিজস্ব মান রক্ষার কথাটিও সে একেবারে ভুলে যেতে পারে না। তাই কখনো স্বামীর আচরণে ক্রোধে জ্বলে উঠে বলে ফেলে— ‘‘ইতর ছোটলোক কোথাকার।”

কিন্তু সেই টকটকে আগুনের মতো মুখটিকেও মুহূর্তে অন্যের সামনে বদলে ফেলে লঘুকণ্ঠে ঠাট্টার জবাব দিতে হয়— ‘‘যান। ভারি অসভ্য আপনি।”

অপমানবোধকে মুহূর্তে আত্মস্থ করে ফেলে কণ্ঠস্বর অকম্পিত রেখে এই সময়োপযোগী হাসিকে সাধ্যমতো ধরে রাখার কৌশল প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা মেয়েদের সমাজের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার, নিজের মুখরক্ষার জন্যে সাধনার ফল।

শিক্ষিত মেয়েদের ভাষার মধ্যে একটি স্বাভাবিক আব্রু থাকে। বিশেষত মধ্যবিত্ত মেয়েদের জীবনে পরিবার সমাজ সংসারের বাধা অনেকখানি। তাই তাদের জীবনে চূড়ান্ত বিদ্রোহ, বিস্ফোরক সংলাপ উচ্চারণ খুব কম ঘটে। নমিতার ভাষায় তাই দাহ ও অসহায়তা একই সঙ্গে মিশে থাকে। সেই জন্যই এই জাতীয় উচ্চারণের পাশাপাশি তার মনোভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক ‘সর্পিণীর’ মতো ফুঁসে ওঠার কথা বলেন, ছোবল মারার কথা সেভাবে আসে না। এর সঙ্গে আসে কয়েক পলক ‘স্তব্ধ’ হয়ে থাকার কথা। শিক্ষিত মেয়েদের কথায় তাই অগ্নি কম থাকে, শুধু অন্তরস্থিত অগ্নিস্রাবের ফলাফল দাহটুকুই তাদের সংলাপে রূপ পায়।

শিক্ষার রকমফেরে মানসিকতাতেও পরিবর্তন ঘটে; যার ফলে চারপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর

বিষয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশের ক্ষেত্রেও শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যে পার্থক্য ঘটে। আশাপূর্ণার গল্পে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত এক শ্রেণীর মেয়েদের দেখা যায়, স্পষ্ট ভাষণ, প্রতিবাদী আচরণের মাধ্যমে যারা নিজস্ব ব্যক্তিত্ববোধের প্রমাণ রেখেছে। এদের অনেকেরই প্রথাগত শিক্ষা তেমন নেই; জীবন থেকে তেমন কিছু পাওয়ার আশাও তারা রাখে না। সে কারণে স্পষ্ট বক্তা হতে এদের বাধে না। পুরুষের মতোই কঠিন বাস্তবকে চেনার ফলস্বরূপ এদের মনোজগৎ অনেকটাই যুক্তিনির্ভর, অপ্রয়োজনীয় আবেগবর্জিত। সংলাপেও তার প্রকাশ।

'ক্ষমতা হস্তান্তর' নামক গল্পটিতে লেখক এই রকমই একজন স্ত্রীলোকের উল্লেখ করেছেন। লোকের বাড়িতে কাজ করে জীবিকা অর্জন করা অশিক্ষিত গরিব ঘরের মুখরা মেয়েটি বাজারের মধ্যে কীভাবে তার মনিবকে জব্দ করল তাই নিয়েই গল্প। নিজের আত্মবিশ্বাসী জোরালো উপস্থিতির প্রমাণ সে রেখেছে উচ্চকিত একটানা ভাষণে। জনতাকে স্বপক্ষে আনবার কৌশল তার খুব ভালো জানা—

''এই দেখো ভাই সবাই তোমরা বড়লোকের অত্যেচার। মাইনে চাইতে গেলাম— বাবুর পরিবার গালমন্দ করে তাড়িয়ে দিলে— আমিও বলি— আচ্ছা বেশ কত ঠকাবি? দেখে নেব বাজারের মধ্যে। একলা মেয়েমানুষ বলে এত নির্ভরসা। গরিবের পাবলিক সহায়।''

পাওনাগন্ডা আগেই মিটে গেছিল। কিন্তু মনিবানীর কাছে অপমানিত হবার শোধ নিতেই মেয়েটির মিথ্যাচার। এতে তার বিবেক মোটেও লজ্জিত নয়। বরঞ্চ আশ্চর্য সপ্রতিভ ভাষায় সে নিজের কাজের জন্য যে যুক্তি দেয় তাতে শুধুমাত্র মনিবের অপমানের বিরুদ্ধে নয়, সমাজ সংস্কার এবং ভাগ্যবিধ্যাতার বিরুদ্ধেও তার প্রতিবাদী কণ্ঠের ধ্বনি শোনা যায়—

''ধম্ম! দুত্তোর নিকুচি করেছে তোর ধম্মর। ও তোর ধম্মই বল আর ভগবান বল, সবই ওই বড়মানুষের ঘরের কেনা গোলাম, বুঝলি? ... কই ভগবান কি কখনো গরিবের মুখ চেয়েছে? তবে চিরদিন সে অনামুখোর ধার ধরবো কেন? তার চাইতে আমাদের পাবলিকই ভালো, তবু গরিবের মুখ চায়।''

পরিশীলিত ভাষায় মার্জিত কণ্ঠের উচ্চারণে যে কথাগুলো বিশেষ গুরুত্ব পেত, অপরিশীলিত নারীর মোটা দাগের আচরণ, বাক্য এবং প্রতিশোধ বাসনার কারণে সে কথাগুলি আপাতভাবে লঘু হয়ে পড়ে। কিন্তু সামাজিক সংকোচের বেড়া ভেঙে জীবনসংগ্রামে অভ্যস্ত মেয়েদের ভাবনা ও ভাষার অনুরূপ নিঃসংকোচ রূপকে আশাপূর্ণা দেবী বারবার দেখিয়েছেন।

'ইজ্জত' গল্পে বস্তিতে বাস করা বাসন-মাজুনির মেয়ে জয়ীকেও প্রতিবাদে মুখর হতে শোনা যায়। মেয়েকে সামাজিক নিরাপত্তা দিতে ব্যাকুল বাসন্তীর অনুরোধে নিজের বাড়িতে তার মেয়েকে রাখতে সুমিত্রা রাজি হয়েছিল। কিন্তু স্বামীর আত্মকেন্দ্রিকতার কারণে সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি। তবু ভদ্র মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহবধূ সুমিত্রার পক্ষে স্বামীর আচরণের প্রতিবাদে চটকদার কিছু করা সম্ভব হয় না। তাই কিছু বাক্য বিনিময় স্থির দৃষ্টি বা পাথুরে কণ্ঠস্বরেই তার প্রতিবাদের প্রকাশ। নিজের পায়ের তলায় জমি আলগা বলেই প্রচলিত সমাজ কাঠামোর বাইরে গিয়ে দুঃসাহসী ভাষণ বা আচরণ কোনটাই করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

গল্পের শেষে বাসন্তীর সামনে এসে সুমিত্রা দাঁড়াতে পারে না। তার অসহ্য মাথা ব্যথা হয়; সেই ব্যথা শারীরিক নয়, মানসিক। আর অশিক্ষিত নিম্নবিত্ত ঘরের মেয়ে জয়ী; তার প্রতিবাদী উচ্চারণ কিন্তু অনেক বেশি উচ্চকিত—

''ঠিক আছে, আর তুই মেয়ের মান ইজ্জতের ধুয়ো ধরে বাবুদের পায়ে ধরতে আসিস নে। বাবুদের কাছে ছোটলোকের মেয়ের ইজ্জতের কোন দাম নেই। বেশ, আমরা যখন ছোটলোক, তখন ছোটলোকের মতনই ব্যবস্থা হোক।'

মন্তব্যের সঙ্গে যোগ হয় সিঁড়িতে শব্দ তুলে জোর পায়ে চলে যাওয়া, যার মধ্যে তথাকথিত ভদ্রলোক সমজের প্রতি একটি স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার ইঙ্গিত আছে।

প্রসঙ্গত মনে পড়বে 'ভালোমানুষ' নাটকের প্রসঙ্গে অভিনেত্রী কেয়া চক্রবর্তীর কথা। সেখানে তিনি শান্তা আর শান্তাপ্রসাদ— নারী পুরুষের দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করেন। সমাজে শুধু ভালো হয়ে বাঁচা যায় না, সেখানে শান্তার সংলাপে উচ্চারিত হয় এই অমোঘ সত্য—

''আমি যখন মেয়ে হয়েছি নরম থেকেছি। তখন কেউ আমাকে বাঁচতে দিতে চায়নি। সবাই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে চেয়েছে। যখন কড়া হয়েছি পুরুষের বেশ পরেছি তখন আমি বেঁচেছি।" (চক্রবর্তী ৩৬৮)

শিক্ষার পার্থক্যের সঙ্গে বিত্তগত পার্থক্যও মেয়েদের সংলাপে কিছু সাধারণ তফাৎ গড়ে দেয়। 'সর্পশিশু' গল্পের অনাথ আস্তাকুঁড়েজাত ফেলি আসলে সম্পূর্ণ বিত্তহীনতার প্রতীক। তবু যে বাড়িতে আশ্রয় জোটে সে বাড়ির সমবয়সী লীলার সঙ্গে নিজের অবস্থার বিপুল ফারাক তাকে প্রতিবাদী করে তোলে। সমাজে শিক্ষাবিহীন ফেলি পড়াশোনা শেখার জন্য যুক্তি পেশ করে—

''সক্কল মেয়ে শেখে কেন তবে, এ্যাঁ? ফেলি যেন মানুষ নয়!"

একটা সহজ সুস্থ জীবনের মিথ্যে স্বপ্নটুকু মাত্র দেখার অপরাধে তাকে চরমভাবে নির্যাতিত হতে হয়েছে। প্রতিবাদে নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে একটা দামী শাড়ি ও একজোড়া কানের পাশা চুরি করে সে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে। তবে তার এই নীরব প্রতিবাদ বামুনবাড়ির বড় কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। কিন্তু মৌখিক সংলাপের বাইরে গিয়ে মেয়েদের প্রতিবাদজাত প্রতিক্রিয়া কেমনভাবে তাদের আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, আশাপূর্ণার গল্প বারবার তার সাক্ষ্য দিয়েছে।

জয়ন্তী ('আত্মহত্যা') ও হৈমন্তী ('নিরুত্তর') কেউই ফেলির সমগোত্রীয় নয়। জয়ন্তী নিম্ন-মধ্যবিত্তের সংসারে অভাব অশান্তির মধ্যে থাকলেও তার একটি ভদ্র নিরাপদ আশ্রয় ছিল। আর হৈমন্তী নিরলস সংসারী, একান্ত বাধ্য মেয়ে। মধ্যরাতে হৈমন্তীকে নিচে রান্নাঘরের অন্ধকারে একা আবিষ্কার করে তার চরিত্র সম্পর্কে ভয়ংকর সন্দেহে আক্রান্ত হয় পুরন্দর। স্ত্রীকে বিনা কারণে অবিশ্বাসী ভাববার সময়ে নিজের আচরণ নিয়ে তার কোনো বিবেক দংশন নেই। এই অপমানের পাল্টা উত্তর দিয়ে হৈমন্ত্রী আত্মহত্যা করে। কিন্তু স্বামীর সন্দেহমোচনের জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করে না। অবলম্বনহীন নিরুপায় মেয়েরা যখন অসম্মানিত হয় তখন

তার প্রতিবাদের সর্বশেষ অস্ত্র হিসেবে নিজের জীবন মর্যাদা ও আশ্রয়কেই সে বাজি ধরে বসে। ''আত্মহত্যা'' গল্পের জয়ন্তীও আত্মহত্যা করেছিল। পিতৃহীন বিরাট সংসারের সমস্ত দায়িত্বগুলি সামলে-দেওয়া নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েটি অনুভব করে দাদা মোহনের সঙ্গে তার অবস্থানগত পার্থক্য। ছেলে বলেই দারিদ্র্য, অসুবিধার মধ্যেও বাড়তি কিছু সুবিধা মোহনকে সামান্য হলেও স্বস্তি দেয়। জয়ন্তীর সে স্বস্তি কোথায়? তাই বাড়িতে তর্কাতর্কি করে মাথা গরম হলে মোহন পার্কে রাত কাটিয়ে আসে, জয়ন্তীকে বহুজনের সঙ্গে একটি বদ্ধ ঘরে গুমরোতে হয়। ফেলির সঙ্গে জয়ন্তীর সামাজিক অবস্থার কিছু পার্থক্য থাকলেও ক্ষমতাবানের কাছে উপেক্ষিত হবার ক্ষোভ প্রকাশের ভাষায় দুজনেরই সাদৃশ্য রয়েছে—

''তবু তো পার্কের বেঞ্চিও আছে তোমাদের, আমাদের তো ক্যাওড়াতলা ছাড়া আর জায়গা নেই।''

মানুষ হিসেবে সম্মান না পাবার কষ্ট ফেলি এবং জয়ন্তীর মধ্যে ভাষাগত সাদৃশ্য এনে দিয়েছে। আর অক্ষম মেয়েদের প্রতিবাদের ভাষা চরম আকার নিয়েছে মৃত্যুতে। জয়ন্তী ও হৈমন্তীর মতো নিম্ন-মধ্যবিত্ত নারীর ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়ায় এখানেই মিল।

আশাপূর্ণার কিছু গল্পে মধ্যবিত্ত মেয়েদের গোপন আকাঙ্ক্ষা ভাষা পেয়েছে। অন্তর্নিহিত বাসনার প্রকাশে পুরুষের মতো তারা অকপট নয়। এর ফলে ইচ্ছা ও সামাজিক শাসনের টানাপোড়েন তাদের সংলাপে নিয়ে আসে ব্যঞ্জনা, আচরণে আনে রহস্যময়তা। 'একদিন একভূমিতে' গল্পে এরকমই জটিলতার প্রকাশ। রক্ষণশীল পরিবারের অবিবাহিতা দুই মেয়েকে মা-বাবার শাসনে ঘরবন্দী হয়ে থাকতে হয়। কিন্তু মুক্ত পৃথিবীর স্বাদ পাওয়ার জন্য তাদের ব্যাকুলতা কিছু কম নয়। পাশের বাড়ির কলেজ পড়ুয়া মেয়েটি গুণ্ডাদের দ্বারা অপহৃত হয়। সমবয়সী মেয়েটির জীবনে এমন দুর্গতিতে তারা আতঙ্কের পরিবর্তে যেন ঈর্ষাই বোধ করে—

''সীতা একটু তিক্ত ব্যঞ্জনাময় হতাশার হাসি হেসে বলল, 'হুঁ, তখনই বুঝেছিলাম! এই আলুভাতে মার্কা ভাগ্যে এবার এসব হতে যাচ্ছে! ... রাবিশ! কেন ঘটনাটা পরেশচন্দ্র সরকারের ঘরের দেয়ালের ওপারে না হয়ে, এপারে হতে পারত না?

গীতা বোনের দিকে একবার মাত্র তাকিয়ে দেখল। ... প্রতিবাদে প্রখর হয়ে উঠল না। ধিক্কারে ফেটে পড়ল না, বিবর্ণ দেওয়ালে ঝোলানো একখানা কোণ ছেঁড়া ক্যালেন্ডারের দিকে চোখ ফেলে জীবনে বোধহয় এই প্রথম ছোট বোনের কাছে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলল, যা বলেছিস!''

অকৃতার্থ জীবনবাসনা সোজা পথে আত্মপ্রকাশের পথ না পেয়ে এভাবে বাঁকা পথ অবলম্বন করে। উত্তেজিত কল্পনায় নানা অদ্ভুত বাসনা পূরণের ইচ্ছে জাগে। সংলাপে সেই আত্মপীড়নজাত হতাশার প্রকাশ। সমাজনীতি নারীর জীবনের বহু সহজাত বাসনাকে অবৈধ বলে চিহ্নিত করে বলেই এমন আত্মপীড়ন। প্রাসঙ্গিক একটি ঘটনার উল্লেখ করছেন আর একজন লেখক—

''লেখিকা আমোদিনী ঘোষের 'ফস্কাগেরো' নামক উপন্যাসে যুবতী দ্বিতীয়া ভার্যা বয়স্ক স্বামীর বদলে সমবয়সী পুরষের ভালবাসা চায়। পুত্রপ্রতিম পুরুষ (সামাজিক সম্পর্কে)-কে দেখে তার মাতৃভাব জাগে না।

লবঙ্গলতা বা পার্বতীর মতো সুমাতা হবার শখ তার নেই। এ নিয়ে স্বামী তাকে কঠোর শাসন করলে সে গলায় দড়ি দেয় এবং তার আগে বিধবার সাজ করে নেয়। পুরুষপ্রতাপের বজ্র আঁটুনির প্রতি তার তীব্র শ্লেষ?" (ভট্টাচার্য ২৫৪)

ব্যতিক্রমী কিছু গল্পে, আশাপূর্ণা নারীর দেহগত আকাঙ্ক্ষাকে স্পষ্ট জোরালো ভাষায় প্রকাশ হতে দেখিয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রামীণ অশিক্ষিত নারীর মুখে এমন ভাষা স্থান পেয়েছে। 'বেহায়া' গল্পের মালতী এরকম এক চরিত্র। মধ্যবিত্তের সংকোচ বোধ তার নেই। আশাপূর্ণার গল্পের মেয়েরা অনেক ব্যাপারে উচ্চকণ্ঠ হলেও দেহকেন্দ্রিক প্রেমের কথায় তাদের কণ্ঠ সাহসী নয়; মালতী সেই সংস্কার ভেঙেছে। মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত স্বামী জেলে। রোজ রাতে নিজের শূন্য ঘরে বসে পাশের কপাট-বন্ধ শ্বশুর-শাশুড়ির ঘরটার দিকে তাকিয়ে তার রোজকার মনোগত সংলাপ—

''নোড়া ছুঁড়ে ওই পলকা কাঠের কপাটখানা ভেঙে দুহাট করে দিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'তোমরা কী? তোমরা কী? হায়া নাই? লজ্জা নাই? মানুষের রক্ত গায়ে নাই?'"

গল্পে তার প্রসঙ্গে এসেছে সর্পিণী আর আগুনের উপমা। মৃত্যুর আগে কয়েক ঘণ্টার জন্য বাড়ি আসে ছেলে। এই সময় একটি দ্রুতগতির রুদ্ধশ্বাস নাটকের ছবি এঁকেছেন আশাপূর্ণা। একদিকে বয়স্ক বাবা মায়ের আকুতি, অন্যদিকে দুই জোয়ান বয়সী নর-নারীর বাসনাবোধ। বয়স্ক বাবা-মায়ের থেকে মালতীর দাবি যে বেশি হিংস্র রুক্ষ, তীব্র কণ্ঠে মালতী সেই দাবি পেশ করে—

''ক্যানো ছেড়ে দেবো? এই জেবনে আর তোমারে পাবো আমি?"

শাশুড়ি যখন বউয়ের নির্লজ্জতাকে ধিক্কার দেয়, তখন শাণিত কণ্ঠে তার পাল্টা জবাব—

''নিজের হলে বুঝতে। সিদিকে তো ষোলোআনা বজায়?"

তীব্র স্পষ্ট সংলাপ কোনও কিছু গোপন রাখেনি, তবুও উচ্চারিত শব্দগুলি অশালীন নয় কোথাও। আশাপূর্ণা ভাষায় আব্রু রক্ষায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর কথায়—

''সাহিত্য তো জীবনেরই প্রতিফলন। তবু আমার নিজস্ব ধারণায়— অনেক ক্ষেত্রে জীবন বড় নগ্ন নির্লজ্জ। সেখানে তাকে সাহিত্যের দরবারে যথাযথ প্রকাশ করতে দিলেও একটা আবরণ থাকা আবশ্যক। সেই আবরণটুকু হচ্ছে ভাষার শালীনতা। শালীন ভাষায় সবকিছু ব্যক্ত করতে পারাও একটি সূক্ষ্ম শিল্প।" (দেবী ২১৯)

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত স্বাবলম্বী নারীর মুখে এক ধরনের ভাষা বসিয়েছেন আশাপূর্ণা, সংক্ষিপ্ত কিন্তু দৃঢ়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনও তীব্র অন্যায় বা অপমানের প্রত্যুত্তর হিসেবে সেই ভাষার ব্যবহার। পূর্বোক্ত 'ইজ্জত' গল্পে বস্তিবাসী বাসন্তী আর তার মনিবানী সুমিত্রার সংলাপকে প্রসঙ্গত তুলনা করা যায়। অশিক্ষিত খেটে খাওয়া মানুষের দল আচরণ বা ভাষায় ব্যঞ্জনা বা রহস্যময়তার ধার ধারে না। উচ্চকিত ভাষায় মেয়ের

সম্পর্কে বাসন্তীর উদ্বেগের সবটুকুই তার সংলাপে স্পষ্ট— ''অহরহ যমের মুখে থাকতে থাকতে মেয়েটা যেন সিঁটিয়ে সিঁটিয়েই কাঠ হয়ে গেছে।''

সুমিত্রার আশ্বাস পেয়ে বাসন্তীর উদ্বেগমুক্তির প্রকাশও উচ্ছ্বাসে ভরা—

''জানতাম আপনার দয়া হবে। আপনি যে সাক্ষেৎ ভগবতী। একে একে কম বাড়িতে তো যাইনি, কেউ কথাটাই শুনতে চায় না কান পেতে।''

পাশাপাশি ভদ্র মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে সুমিত্রার বাকভঙ্গি অনেক সংযত। স্বামী যখন স্ত্রীর মতামতের দাম দেয় না তখন কাটাকাটা কিছু বাক্য তার কণ্ঠে উচ্চারিত—

''তার মানে বাসন-মাজা ঝি-টার কাছে স্বীকার করতে হবে এই সংসারে আমার কোনো ক্ষমতা নেই।''

ঘরে কম বয়েসের মেয়েকে রাখার বিপদ সম্পর্কে স্বামী মহীতোষ যখন ঠাট্টার ছলে সচেতন করে তখন সুমিত্রার গলা আশ্চর্য শান্ত অনুত্তেজিত—

''তাহলে তো আরওই রাখতে হয়। সোনা কি পেতল যাচাই হয়ে যায়।''

সংক্ষিপ্ত সংলাপগুলোর সঙ্গে তার 'পাথরের মতো গলা', 'স্থির চোখে' চাওয়া, 'বাঁকা হাসি'র প্রতিক্রিয়াগুলি উল্লিখিত হয়েছে। কারণ স্বরক্ষেপনের সূক্ষ্মতায়, মুখের রেখার প্রতিক্রিয়ায় সংলাপের অন্তর্গূঢ় অর্থকে প্রকাশ করা শিক্ষিত জনেরই আয়ত্তাধীন; তুলনায় বাসন্তীরা বহুভাষী; মনের ভাবকে কথার তোড়ে সবটা প্রকাশ করে ফেলাই তাদের রীতি। অবশ্য কথার সঙ্গে ভাব তাদের মুখেও ফোটে, তবে সে ভাব অতি প্রাঞ্জল। সুমিত্রাদের মতো মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষের ইঙ্গিতবাহী সংলাপ তাদের অনায়ত্ত।

অন্য মানুষকে গভীরভাবে বিশ্বাস করে তার ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হয়ে ওঠা নারীর নির্ভরতাকেও ভাষারূপ দিয়েছেন আশাপূর্ণা। জীবনে বহু প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে কারও সম্পর্কে তার স্থির বিশ্বাস জাগলে সেই মানুষটির সঙ্গে বিনিময় করা সংলাপে গভীর আত্মস্থ ভাব ফুটে উঠতে দেখা যায়। 'ছুটি নাকচ' গল্পে মালতী এভাবেই পূর্ব পরিচয়হীন এক গুণ্ডাকে সহজেই বিশ্বাস করেছিল। স্বামী সন্তানের মঙ্গল কামনা করতে গিয়ে ক্ষণিক ভুলের মাশুল স্বরূপ তাকে জেলে হতে হয়েছিল। মুক্তিলাভের পর একই দিনে মুক্তি পাওয়া নিকুঞ্জ গুণ্ডার তার সঙ্গে যেচে আলাপের পেছনে মতলব আছে ভেবে সে প্রথমে আশঙ্কিত হয়েছিল। কিন্তু আত্মপরিচয় বিষয়ে ভানহীন লোকটার স্পষ্ট কথাবার্তা তাকে খানিকটা নিশ্চিন্ত করে। মুক্তির পরে জেল থেকে বেরিয়ে একেবারে একলা পড়া মালতী পরবর্তী অনিশ্চিত অবস্থায় অনায়াসে প্রায় অচেনা মানুষটির উপর নির্ভর করে যখন ঠকে না, তখন কিছুটা দাবির সুরে সে বলতে পারে—

''বুঝেছি তোমার ওপর খুব জুলুম হচ্ছে। কিন্তুক আমার একটা ব্যাবোস্তা না করেও তো তোমার ছুটি নাই।''

শেষ পর্যন্ত চেনা সংসারে জেলফেরৎ মালতীর জায়গা হয়নি। একদিন যাদের রক্ষা করতে গিয়ে তার জেল যাত্রা সেই মানুষগুলোই মুহূর্তে তার কাছে অচেনা হয়ে পড়ে। আর এই কঠিন সংকটের সময়ে অচেনা মানুষ হয়ে ওঠে একান্ত আপনজন। এই গভীর সত্য অনুধাবনের পর নিকুঞ্জের ওপর নির্ভর করতে মালতীর আর কোনও দ্বিধা থাকে না তেমনই জীবন সম্পর্কে সদ্য অর্জিত জ্ঞান তার কথার সুরে আনে একরকমের আত্মস্থ দার্শনিকতা—

''একদা এই সজনেপোতা থেকেই দুই মনিষ্যি মনের খেদে বেরিয়ে পড়েছিলুম যা আছে ললাটে বলে। আজও আবার সেই ঘটনা, সেই বৃত্তান্ত।''

মালতীর মতোই আত্মস্থ ব্যক্তিত্ব অর্জন করে যে মেয়ে, তার সংলাপ ও আচরণ হয়ে ওঠে যুক্তিনির্ভর আবেগবর্জিত। নিঃসম্পর্কিত একটি পুরুষ মানুষের সঙ্গে বাকি জীবন কাটানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় মালতীর সংলাপে কোনও দ্বিধা ফোটে না। অনুরূপ অকম্পিত ছিল মুকুলের কণ্ঠস্বরও। 'একটি ফুটো পয়সার জের' গল্পে মুকুল সামান্য একটা পয়সা হারিয়ে স্বামীর বিদ্রূপ বাক্যে তিরস্কৃত হয়েছিল। অতঃপর সে স্বভাববিরুদ্ধভাবে শান্ত হয়ে যায়। গোপনে সাধ্যমতো উপার্জনের সন্ধান করতে করতে পরিশেষে পেয়েও যায়। স্বামী প্রভাতকে সে হিসেব দেয়—

''বিদ্যে নেই, সাধ্যি নেই, ন'শো পঞ্চাশ দেবেই বা কেন? দৈনিক চার টাকার হিসেব। ঘণ্টা পিছু এক টাকা আর কি। ওইতেই কি আর সত্যি সবটা কুলিয়ে যাবে আমার? তোমারও লাগবে কিছু কিছু।... তা তোমার সংসারেও তো অনেক খাটি, সে সময়টা ঠিকই বজায় রইলো।''

নিতান্ত ঘরকুনো সংসারসর্বস্ব মুকুলের এই অভাবনীয় পরিবর্তন এক হিসেবে প্রতিবাদী মর্যাদাবোধ জাগরণের ফলও বটে। একটি অভিভাষণে এই বিষয়ে আশাপূর্ণা স্বয়ং বলছেন—

''আসল কথা, আমরা আমাদের মূল্য সম্বন্ধে সব সময় সচেতন থাকি না, আমাদের সুখদুঃখ আনন্দবেদনার অনুভূতিগুলো নিত্যদিনের বোঝা বইতে বইতে ভোঁতা হয়ে যায়। মোটা কথা আর মোটা চিন্তার ধূলিজালে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এই ধূলি আবরণ ভেদ করে আমার ভিতরের আমিটিকে দেখতে ভুলে যাই। নিষ্ক্রিয় চিন্তায় স্তিমিত সেই আমিটাকে যেন দিনরাত্রির আবর্ত্তনের হাতে সমর্পণ করে বসে থাকি।'' (দেবী ১৪২)

মুকুলের এই আত্মস্থ প্রতিক্রিয়া নয়, অন্নমাসির আত্মসম্মান ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। 'নিরাশ্রয়' গল্পের সৎ বোনপোর কাছে আশ্রিত অন্নমাসির আপনজন বলতে একমাত্র নেশাখোর সন্তান কেষ্টা। বিভূতির স্ত্রী রমলার অপমানের প্রত্যুত্তর দেওয়ার মতো পৃষ্ঠবল তার ছিল না। কিন্তু এই বৃদ্ধার আত্মমর্যাদাবোধ তা বলে কিছু কম নয়। পূর্ববর্তী গল্পের মুকুল স্বামীর কাছে মর্যাদা রক্ষার মূল্যস্বরূপ তার নিরবচ্ছিন্ন সংসার প্রীতিকে বিসর্জন দিয়েছিল। আর অন্নমাসি নিজের পুত্রশোকের মূল্যে আপন আত্মমর্যাদা ক্রয় করেছিল। সন্তানের মৃত্যুর খবর জেনেও না জানার ভান করা, অন্নমাসির এই আচরণ আসলে নিজের অসহায় অবস্থাকে লোকের কাছে গোপন রাখার নিরুপায় চেষ্টা মাত্র। শেষে বিভূতির কাছে তার স্বীকারোক্তি—

''ভেবেছিলাম মোদো মাতাল যা হোক তবু তো ছেলে, তার আশ্রয় জোরের আশ্রয়। সে নাম মুছে গেলে ত্রিজগতে আর মুখ কোথায় আমার? নিরাশ্রয় হয়ে পরের ঘরে থাকা যে বড়ো ঘেন্না। ... রাগ করিসনে বাবা, বৌমা বড়ো নিষ্ঠুর, বড়ো অহংকারী। মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না, বড়ো হেয় বোধ হয়ে থাকতে হয় ওর আশ্রয়ে। সেই ওর কাছেই আমি নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে আছি এ কথা স্বীকার করতে পারছিলাম না। তাই মা হয়ে আমি আজ ছ' মাস— এই শোক চাপা দিয়ে—''

মৃত সন্তানকে জীবিত প্রমাণ করে অন্নমাসির যে অভিনয়, চড়া দাগের সংলাপ রচনা— তার মধ্যে নিজের নিঃসহায় অবস্থার লজ্জাকে গৌণ করে দেওয়ার করুণ প্রচেষ্টা রয়েছে। আশাপূর্ণা দেখাতে চেয়েছেন অতি সাধারণ মেয়ের মধ্যেও আত্মসচেতনতা ও মর্যাদাবোধ কিছু কম থাকে না। শুধু নিরুপায় অবস্থার কারণে তার প্রকাশ ঘটে অন্যরূপে।—

''কাপুরুষ তো ইতিহাস লেখে না। নারী কবি মহাকবি নেই। থাকলেও নিজেদের মান লজ্জা মর্যাদা সম্মানহানির কথা লিখতে পারতেন না। সে ভাষা আজও পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়নি।'' (দেবী ১৭)

পিতৃতন্ত্রের পরিচিত সংজ্ঞার বাইরে যাওয়া মেয়েদের সংলাপে আশাপূর্ণা প্রসাধিত নারীত্বের ব্যতিক্রমকে দেখিয়েছেন। 'পরিবর্তন' গল্পের চিত্রা চরিত্রটি যেমন; স্বার্থসর্বস্ব নেশাখোর বাবার জন্য ভদ্রঘরের মেয়েটি অভ্যস্ত নৈতিকতার সীমা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু ধনী ভাড়াটের বিনোদনের সামগ্রী হয়ে টাকা যোগাড় করে আনতে বাধ্য হওয়া চিত্রার নৈতিক অবনমনের পরিমাণ তাকে এ পথে ঠেলে দেওয়া বাবার থেকে বেশি নয়। সেই বোধ থেকে চিত্রার কণ্ঠস্বরে শীতল কাঠিন্য ফুটে ওঠে; এক গোছা নোট মায়ের দিকে ফেলে দিয়ে সে স্থির আর ঠাণ্ডা গলায় বলে—

''এই নাও, ধার নয়, দাম দিয়ে আনা।''

মা অপর্ণা যখন মেয়ের জাত খুইয়ে আসার জন্য তীব্র ধিক্কার দেয়, তখন সে স্থির আর ঠাণ্ডা গলায় বলে—

''ভাতও চাই জাতও চাই, এতো আবদার চলে না মা।''

আশাপূর্ণার গল্পে নারীর কর্তৃত্বের ভাষারও সফল রূপায়ণ ঘটেছে। এক্ষেত্রে বয়স বিত্ত শিক্ষা কোনও বাধা হয়নি। 'পতঙ্গ' গল্পের মানদা, বীণার মা, বীণা এই তিন অসমবয়সী নারীর কথাই ধরা যাক। গ্রামীণ খেটে খাওয়া গরীব গৃহস্থ ঘর থেকে মানদা একদিন রুজির সন্ধানে শহরে গিয়ে ক্রমশ ধনী ঘরের নির্ভরযোগ্য কাজের লোকে পরিণত হয়েছিল। অতঃপর ঝি-গিরির পথ বেয়ে স্বাবলম্বন ও আত্মবিশ্বাস খুঁজে পায় মানদা ও তার অনুগামীরা। সেই আত্মবিশ্বাসের জোরেই গ্রাম্য সমাজপতিদের সামনে 'বিদ্রুপ হাস্যমণ্ডিত দৃষ্টিতে' তাকিয়ে মানদা বলার ক্ষমতা রাখে—

''গাঁয়ের লোক নিন্দে করতে পারবে, অথচ একমুঠো ভাত দিতে পারবে না, তাহলে অবীরে বেধবা যায় কোথা?''

এই সাহসের উত্তরাধিকার মানদা থেকে বীণার মা হয়ে বীণাতে এসে বর্তায়। সদ্য বিবাহিত বীণা কয়েক দিনের জন্য কলকাতায় বেড়াতে এসে নিজের উদ্যোগে স্থায়ী ব্যবস্থা করে নেয়। গ্রামের মেয়েটি অতঃপর স্বামীর 'গায়ে একটি পিঠ চাপরান গোছ স্পর্শ' দিয়ে 'অপরূপ ভঙ্গিতে তাচ্ছিল্যের হাসি' হেসে গ্রামের মানুষের অকারণ আতঙ্ককে উড়িয়ে দেয় অনায়াসে—

''পিসে সবজান্তা! আসুক না কেউ খারাপ করতে, টিট করে দেব না?''

মাত্র কয়েক দিনের শহরবাসেই বীণা এই আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছে, সংলাপে যার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। সুযোগ পেলে ঘরোয়া মেয়েরাও যে আত্মবিশ্বাসী কর্তৃত্ব ও দৃঢ়তা অর্জন করতে পারে এই সংলাপ তারই সাক্ষ্য দেয়।

নারীর মুখে আত্মধিক্কার আর অসহায়তাজনিত দ্বন্দ্বের ভাষাকেও আশাপূর্ণা রূপ দিয়েছেন। স্বেচ্ছাকৃত আত্মপীড়ন মেয়েদের একটি স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য, সংলাপেও তার প্রকাশ ঘটে। 'ঊর্ননাভ' গল্পে তারকদার স্ত্রী তারই একটি উদাহরণ। সন্দেহকাতর স্বামীর জন্য ঘরবন্দী অসামাজিক জীবন যাপন করতে বাধ্য হন তিনি, কিন্তু স্বামী সম্পর্কে ভয় বা সমীহবোধ নয়, লজ্জাবোধেই তাঁর এরকম আচরণ। নতুবা সংলাপে থাকত না এমন তীব্র বিদ্রূপ—

''আমি গিয়ে দাঁড়ালে ও তোমাদের ম্যাজিক ফ্যাজিকের দিকে কি আর দৃষ্টি থাকবে কারুর? দেশশুদ্ধ ব্যাটাছেলে যে আমার পানেই হাঁ করে চেয়ে থাকবে! তখন? অতগুলো দৃষ্টিবাণ সহ্য করে কি আর আস্ত দেহটা নিয়ে ফিরে আসতে পারব? হয়তো ক্ষইতে ক্ষইতে কর্পূরের মতো উবেই যাব।''

আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষটির মার্জিত কথাবার্তা বুদ্ধিমত্তা রসবোধে কোথাও তাঁকে ব্যক্তিত্বহীন বলে মনে হয় না। তবুও স্বামীর শাসন মেনে স্বেচ্ছাকৃত কৃচ্ছ্রসাধনের অর্থ কী? তাঁর নিজের জবাবের আড়ালে আত্মাধিকার ও আত্মনিগ্রহের স্বরূপকে অনুধাবন করলেই টের পাওয়া যায়।—

''কত জন্মের মহাপাতকের ফলে ওর হাতে পড়েছি, আবার এ জন্মে পাপ কুড়োচ্ছি। কিন্তু কি করবো বল? খাওয়ার কষ্ট যে তোমার দাদা মোটে সহ্য করতে পারেন না, রান্না পছন্দ না হলে খাওয়াই হয় না সেদিন। অন্য কারুর হাতে পড়লে কি আর ওঁর শরীর টিকবে!''

অতএব স্বামীর ঘর থেকে বিতাড়িত হয়েও তিনি গোপনে নিজের হাতে রান্না করে ভৃত্যের মাধ্যমে স্বামীর সেবা করতেন। গল্পের নাম 'ঊর্ননাভ'। জালের কেন্দ্রে স্থিত মাকড়সাটির মতোই বৌদির অপমানিত জীবনের মূল কেন্দ্রে আসলে তারকদা নয়, বৌদি স্বয়ং উপস্থিত। স্বামীকে উপলক্ষ্য করে কঠিন আত্মনিগ্রহের সংলাপ যে উচ্চারণ করেছে তাতে নারীজন্মের প্রতিই তার ধিক্কার প্রকাশ পেয়েছে। এমন আশ্চর্য আচরণের অন্তরালের মনস্তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করে সমালোচক বলছেন—

''আশৈশব একটি পুরুষের ও নারীর পোশাক খাদ্য খেলা কাজ মেলামেশা ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে যে বৈষম্যের অভিজ্ঞতা হয় তার ফলেই নারী নিজেকে দোষারোপ করতে শেখে, আর পুরুষ শেখে নিজের

দোষ অন্যের উপর চাপাতে। পৌরুষের সঙ্গে সমার্থক ক্রোধের হিংস্র প্রকাশ, নারীত্বের মানে হয় মানিয়ে নেওয়া, আত্মপীড়নের মূল্যেও।" (বসু ১৫৬)

আশাপূর্ণার গল্পে ধ্বনিগত সংলাপের পরিবর্তে শরীরী ভাষায় নারীর সংলাপ উচ্চারণের ছবি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ধরা দিয়েছে। 'দেবাঃ ন জানন্তি' গল্পে কোকিলার আচরণের মধ্যে এমন ভাষারই প্রকাশ। প্রবাসী ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের এই কিশোরী বন্ধুটি তার 'অপর্যাপ্ত' হাসি, 'স্বচ্ছ অনাবিল চাপল্য, চঞ্চলতা' দিয়ে সাহেবের প্রতি তার অনুকূল মনোভাবের স্পষ্ট প্রকাশ ঘটিয়েছে। কিন্তু সাহেবের ভাবী বউয়ের খবর পেয়ে কোকিলা 'আর হাসে না'।

''নিবিষ্ট চিত্তে বেশ কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে ফ্রেমে বাঁধা ফটোটা টেবিলে হেলিয়ে দিয়ে কোকিলা ভারিক্কি চালে বলে, বেশ বৌ।"

কণ্ঠস্বরে কিশোরীসুলভ চাপল্য পলকে উধাও হয়ে যেতেই কোকিলার অন্তর্গূঢ় মনোভাবটিকে বুঝতে অসুবিধা হয় না। বিবাহের পর নববধূ নিয়ে ফিরে আসা সাহেবের সস্নেহ আমন্ত্রণে সে সাড়া দেয় না—

''... অনিচ্ছামন্থর গতি, বেশ বোঝা যাচ্ছে ভাইয়ের তাগিদের জোরেই এসেছে। ... যুবতীসুলভ ঈর্ষাকুটিল দৃষ্টি পেল কোথায়? কেনই বা?... ঈষৎ ঘাড় বেঁকিয়ে, একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে কোকিলা, না দেয় উত্তর। না করে আসবার চেষ্টা।"

এই শরীরী সংলাপকে পুরুষের থেকে বেশি চেনে নারী। কারণ এ তো একান্তই তার নিজস্ব ভাষা। তাই ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বিস্মিত হলেও সদাহাস্যময়ী চিত্রার ঘরে বেজেছে তীব্র অসহিষ্ণুতা।

আশাপূর্ণার গল্পে ব্যবহৃত নারীর সংলাপে শব্দসমষ্টি বাক্যবিন্যাস অত্যন্ত সাধারণ, দৈনন্দিন জীবনের চেনা ভঙ্গিতেই উচ্চারিত। কিন্তু সাধারণ একটি মেয়ের কণ্ঠে পরিচিত সংলাপ কিংবা নিরীহ ব্যবহারে কিছু বাড়তি মনোযোগ দিলে অন্তরালে চরিত্রের অচেনা চেহারা ধরা পড়ে। সম্পূর্ণ মানুষটি তখন নতুন মানে নিয়ে উদ্ভাসিত হয়। কখনো স্পষ্ট প্রাঞ্জল কখনো সংক্ষিপ্ত সঙ্গত ভাষ্যে এক-একটি চরিত্র এভাবেই আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। একটি সাহিত্য সম্মেলনের ভাষণে আশাপূর্ণা দেবী মানুষের আপন অনুভবকে অভিব্যক্ত করার প্রসঙ্গে বলেছেন

''... যে ব্যাকুলতা তাকে অস্থির করেছে, সে ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করার উপযুক্ত ভাষা তার ছিল না। আজই কি আছে? সকলেরই কি থাকে? উপলব্ধি কতটুকুই বা ভাষায় প্রকাশ করা যায়? মনে হয়ে যেন অনাদিকাল থেকে এসব অব্যক্ত ব্যাকুল ইচ্ছেগুলো কোনো একখানে জমা হতে থাকে। আর কখনো একসময় হঠাৎ কারো কলমে তার আত্মপ্রকাশের ভাষা পায়।" (দেবী ১৪৯)

উদাহরণ হিসেবে আশাপূর্ণা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা বলেছেন। কিন্তু বহুকাল থেকে মেয়েদের 'ব্যাকুলতা' 'উপলব্ধি' 'অস্থির' অনুভূতিগুলিকে অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত করে তুলতে তাঁর নিজস্ব সাফল্যও তো নিশ্চিতভাবেই একটি উদাহরণ।

মেয়েদের সংলাপে বিচিত্র অনুভূতির প্রকাশের নানা মাত্রা রয়েছে। সে সংলাপ নিছক মেয়েলি নয়, একজন মানুষের নিজের কথা। পরিবেশ তাকে যেভাবে গড়ে তোলে তার বাইরের রূপে সেই প্রভাবই ফুটে ওঠে। সংলাপে তাই বহু ক্ষেত্রেই কোনও নারী নিছক মেয়েলি হয়ে ওঠে। কেননা বাইরের সমাজ সংসার মেয়েদের এই বিশেষ আকার দেয়। কিন্তু এরপরেও থেকে যায় কিছু অশ্রুত সংলাপ। যে সংলাপ মেয়েদের নিজস্ব মনোগঠনজাত। নারীর সংলাপে তাই নাটকীয়তা বেশি; কারণ সমাজ আরোপিত নারী হয়ে ওঠার দায়ের সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতরের মানবীর নিজস্বতাকে যথাযথ রূপে প্রকাশের তাগিদ— দুই নারীসত্তার সংঘাতই তাদের সংলাপে এনে দেয় প্রত্যাশিত নাটকীয়তা। সেই কবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে রোহিণীর সু আর কু মনের দ্বন্দ্বের কথারূপ দিয়েছিলেন। মেয়েলি সংলাপে তাই অজস্র ভঙ্গি, বিবিধ ভাঁজ; বহু পরতের আড়ালে যে মেয়েটি বিরাজ করে তার রহস্যময় স্বরূপকে চিনে নেওয়া সেই সমাজের পক্ষে দুরূহ যে সমাজ একটি নির্দিষ্ট মাপে আর খাপে মেয়েদের সীমাবদ্ধ করে রাখতে অভ্যস্ত। তাই আজও বহু ক্ষেত্রেই মেয়েদের নিজের কথা নিজের মতো করে বলবার চেষ্টাকে নানা বিশেষণে অভিহিত করা হয়। মেয়েলি কোন্দল হয়, কিন্তু পুরুষালি ঝগড়া হয় না। কেন না ঝগড়া বা কোন্দলের মধ্যে যে নিম্নতর লড়াইয়ের ইঙ্গিত থাকে সে যেন সামাজিকভাবে মেয়েদেরই অধিকারে। অবশ্য নারীর কথারূপকে চেনা সমাজে পরিচিত সংস্কৃতির মধ্যে কখনও কখনও গুরুত্ব সহকারে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়। এভাবেই কুরুরাজসভায় দ্রৌপদীর সংলাপ নিয়ে গড়ে ওঠে নাটক বা কবিতা। কারণ নারীর নিজস্ব ভাষা সমাজের সাধারণের কাছে অশ্রুতপূর্ব ছিল বহুদিন; সেই কারণেই বর্তমানে এমন সংলাপ শোনার বা শোনানোর মতো। আর অভূতপূর্ব বলেই সেই কথারূপ সাহিত্যের বিষয় হিসেবে প্রাধান্য লাভ করেছে।

অন্য আরেকটি দৃষ্টিও আছে। নারীর নিজস্ব সংলাপ বলেই সময়বিশেষে এই বিষয়টি সমাজের চোখে লঘু পরিহাসের যোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। কারণ মেয়েদের মতামত গুরুত্বহীন, সর্বক্ষেত্রেই; বড়জোর শিশুর অস্ফুট বুলির মতোই তাদের কথাকে লঘু চালে নেওয়া যায়; কখনও বা তাও নয়; কারণ শিশুর চাপল্য অপরিণত বয়সের বলেই সহনযোগ্য, উপভোগ্য। কিন্তু নারীর বয়সোচিত পরিণতি থাকলেও সেই পরিণতির জন্য সমাজের থেকে যথার্থ মর্যাদা বা স্বীকৃতিজাত প্রাপ্তি নেই। অতএব কোনও মেয়ে যখন কোন বিষয়ে তার মত জোরের সঙ্গে প্রকাশ করে তখনই তার ওপর প্রতিবাদী ভাষার ছাপ দেগে দেওয়া হয়। জীবনের নানামুখী চেতনার মধ্যে বিচরণের সুযোগ পাওয়া পুরুষের পৃথিবীতে যতটা আলো পড়ে নারীর জগত কিন্তু তেমন নয়। সে কারণেই আলো আঁধারের বিমিশ্র সংলাপে সব সময় নারীর ভাষ্য হয়ে ওঠে রহস্যময়।

মেয়েদের কথোপকথন শুধু বার্তা পরিবেশন করার বা ভাব বিনিময়ের জন্য সংযোগ সেতু নয়, ভাষার সীমানা পার হয়ে ভাষাহীনতার স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে নারীর ভাষা পায় প্রত্যাশিত নাটকীয়তা, রহস্যময়তা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় আশাপূর্ণার মতোই আর একজন নারী কথাসাহিত্যিকের সৃষ্ট চরিত্রের উপলব্ধিকে— শতদ্রু নামে মেয়েটি যেখানে বুঝেছিল রূপে গুণে বৈভবে পুরুষের মন যুগিয়ে চলতে পারা মেয়েদের জীবনেই দাক্ষিণ্য মেলে; আর যে মেয়ের সে সামর্থ্য নেই, তাকে সুরক্ষা ও সম্মানের বৃত্ত থেকে বিতাড়িত হতে হয়। শতদ্রু লেখে—

''আমরা কত দীন, কত অসহায়! ... চিরকালের স্বাচ্ছন্দের মোহে সুখের দায়ে মূঢ় ভয়ে অসত্যের বোঝা বয়ে আদর্শ মেয়ে হয়ে থাকি। মনে কিছু হলেও যার বলবার ভরসা নেই। কি মিথ্যে-ভরা ক্ষুদ্রতা ভরা জীবন আমাদের। চিরদিন মিথ্যে শুনি, বলি, আর তা আদর্শ বলে বিশ্বাসও করি।'' (দেবী ১৬৪)

আশাপূর্ণাও প্রায় একই ভাষায় কথা বলেন। তাঁর 'অভিনেত্রী' গল্পের অনুপমার মতো সংসারের সবার কাছে জনপ্রিয় নারীর প্রসঙ্গে তিনি লেখেন—

''নদীর মতো আপন বেগে প্রবাহিত হতে চাইলে চলবে কেন তার?... একদিকে ভরা করে তুলতে— অপরদিকে ভাঙন ধরানোর মতো বোকামি তার নেই। ... অনাদরকে তার বড় ভয়। বড় ভয় অবহেলাকে।''

কিন্তু তিনি এখানেই থেমে যাননি; মেয়েদের এই মূঢ়তার গভীরে অন্যতম ছলনার উল্লেখ করেছেন। অহংকৃত পুরুষসমাজের প্রতি আনুগত্যের আড়ালে মেয়েদের তীক্ষ্ণধীতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, স্বামী-পুত্রের আস্ফালনের সময় ঘরোয়া আটপৌরে অনুপমার ঠোঁটের কোণের সূক্ষ্ম হাস্যরেখায়। সহজাত বোধ ও বুদ্ধিমত্তাকে মেয়েরা পুরুষের সামনে গোপন করে রাখে, আশাপূর্ণার মতো জ্যোতির্ময়ীও এমনটাই বলতে চেয়েছেন বলেই কি তাঁর গল্পের নাম 'অনৃতভাষিণী'?

'অভিনেত্রী' গল্পটি আশাপূর্ণার অজস্র গল্পের মধ্যে একটি প্রতিনিধিস্থানীয় গল্প। অন্তর্গূঢ়সংলাপ, সংলাপহীন সংলাপ তথা আচরণগত ভাষ্য, বাচনভঙ্গিজাত সংলাপ (অর্থাৎ যেখানে শুধু কথার সুরের তারতম্যটিই আসল, উচ্চারিত শব্দগুলি নয়), স্পষ্ট প্রখর সংলাপ (মেয়েদের কাছ থেকে এমন সটান বাক্য শুনতে অনভ্যস্ত সমাজের কাছে এটাও এক প্রকার অভাবনীয় অভিজ্ঞতা), এমন নানা ক্ষেত্রে চেনা নারীকে অচেনা স্বরূপে উপস্থিত হতে দেখে সমাজ। 'অভিনেত্রী'তে সেই নারী অনুপমা, যে সংসারের ভারসাম্য রক্ষার তাগিদে আত্মবিশ্বাসী মানুষের ঠুনকো অহংকে পরিপাটি করে রক্ষা করে। আসলে সে বা তারা যা বলে তার সবটাই সংসারে অহংকারের খেলায় বিভোর শিশুতুল্য চরিত্রদের মমতায় বা অনুকম্পায় জীবনব্যাপী রক্ষার কৌশল। কিন্তু দিনের শেষে একটি মেয়ে নিজের অস্তিত্বগত সত্যকেও তো অস্বীকার করতে পারে না। অতএব সেই অস্তিত্বের প্রকাশের প্রয়াসটিকে সে ঠিকই জমিয়ে রাখে, কাজে এবং কথায়।

এই প্রসঙ্গে আশাপূর্ণার ব্যক্তিত্বের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা যায়। দীর্ঘদিন তিনি লেখক হিসেবে ছিলেন অন্তঃপুরচারিণী; মধ্য চল্লিশ বয়সে প্রথম বাইরের সাহিত্যিক মহলে তাঁর আত্মপ্রকাশ। তাঁর বহু প্রকাশক দীর্ঘদিন তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন না, অন্তরালীন ব্যক্তিত্বের মধ্যে স্থিত থেকেও তাঁর লেখালেখি নিজস্ব ধার হারায়নি। নিজের বলবার কথাটিকে যথাযথভাবে প্রকাশ করবার শিল্পিত কৌশলটিকে যত্ন সহকারে তিনি আজীবন রক্ষা করেছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যায় বহু মহিলা লেখকদের সৃষ্ট নারী চরিত্রদের মধ্যে বারবার ব্যক্তিত্বের এমন দ্বৈধ প্রকাশ দেখা গিয়েছে। বাইরে প্রথাগত পরিবেশে, সমাজ ও পরিবারের শাসনে বাধ্য অনুগত যথাসাধ্য মানিয়ে চলা নারীরা সেখানে যেন পুরুষশাসিত সমাজে ছায়াস্বরূপ উপস্থিত। তাদের নিজস্ব কথা অনেক ক্ষেত্রে জীবনভর অন্তরালেই থেকে যায়। সে কারণেই এইসব নারী চরিত্রদের সংলাপ আচরণের মধ্যে একপ্রকার অস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকে। তাদের অন্তর্গত ভাবনার জগত বাইরের আমির

প্রকাশের আড়ালেই থেকে যায়। কখনও কখনও ভেতরের সত্তাটিকে মেয়েরা নিজেরাই চিনতে পারে না। আরেক প্রখ্যাত সাহিত্যিকের কথায়,

(আশাপূর্ণা)— ''...বড় জটিল। একটি প্রতারক প্রচ্ছদের আড়ালে রাখেন নিষ্ঠুর সত্যটাকে। যেমন প্রতারক তাঁর বক্তিত্ব— ঘরোয়া গিন্নিবান্নি আটপৌরে জীবনের আড়ালে লালন করেছেন তীব্র মননশীল ধীমতী একটি নারীকে।" (দেবসেন, ৮৯-৯০)

আশাপূর্ণার হাতে সৃষ্ট চরিত্রদের সংলাপেও তাঁর ব্যক্তিসত্তার প্রতিফলন ঘটেছে। সে চরিত্র শহুরে বা গ্রামীণ, ধনী বা দরিদ্র, অভিজাত বা অনভিজাত, যেমনই হোক; আসলে তাঁর কলম তো সেই অন্তঃপুরচারিণী মেয়েদেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে যারা সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে (সময়বিশেষে সেই নাগরিকত্বের সাধারণ মর্যাদাটুকুও এদের অনেকেই জীবনভর পায়নি) কাটিয়ে দিয়েছে। অথচ তাদের চেতনা, সহজাত বুদ্ধিমত্তা, মর্যাদাবোধ কোনও অংশে কিছু কম ছিল না। শুধু প্রসাধিত শিক্ষা ও সামাজিক সমর্থনের পালিশটুকুর অভাবে তারা অনেকেই থেকে গেছে না-কাটা হীরের মতো। তাই আশাপূর্ণার নিজের ক্ষেত্রেও বাইরের ব্যক্তিত্বে আচরণে সহজ কথাবার্তার অন্তরালে বুদ্ধিশালিনী অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষটির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

উল্লেখপঞ্জি

১। ঘোষ, সুদক্ষিণা, ''সে ভাষা ভুলিয়া গেছি', মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা, ১ম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮, ৩০৮

২। চক্রবর্তী, কেয়া, ''আলোর বৃত্তে : মঞ্চে", সাক্ষাৎকার, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রিতা বন্দ্যোপাধ্যায় রায়, মেয়েদের উপকরণ মেয়েদের স্মৃতিকথা, পুস্তক বিপণি, ২০০৪, ৩৬৮

৩। দেবী, আশাপূর্ণা, ''যা দেখি তাই লিখি", আর এক আশাপূর্ণা, ১ম সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪০১ বঙ্গাব্দ, ২১৯

৪। দেবী, আশাপূর্ণা, ''সভানেত্রীর অভিভাষণ, নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, ডিসেম্বর ১৯৭৩", আর এক আশাপূর্ণা, ১ম সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪০১ বঙ্গাব্দ, ১৪৯

৫। দেবী, আশাপূর্ণা, ''সভানেত্রীর অভিভাষণ, বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, ডিসেম্বর ১৯৯২", আর এক আশাপূর্ণা, ১ম সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪০১ বঙ্গাব্দ, ১৪২

৬। দেবী, জ্যোতির্ময়ী, ''ভূমিকা - এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা", জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন, ১২৫, ঘোষ, সুদক্ষিণা, ''সে ভাষা ভুলিয়া গেছি', মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা, ১ম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮, ১৭

৭। বসু, জয়ন্তী, ''নারী ও মনস্তত্ত্ব", রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী সম্পাদিত, প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা, ১ম সংস্করণ, ঊর্বী প্রকাশন, ২০০৮, ১৫৬

৮। ভট্টাচার্য, সুতপা, ''নারী ও সাহিত্য : আধুনিক যুগ", রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী সম্পাদিত, প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা, ১ম সংস্করণ, ঊর্বী প্রকাশন, ২০০৮, ১৫৬

৯। দেবী, জ্যোতির্ময়ী, ''অনৃতভাষিণী", সোনা রূপা নয়, দে'জ পাবলিশিং, ২০০২, ১৬৪

১০। দেবসেন, নবনীতা, ''ক্যানডিড ক্যামেরায় ধরে রাখা অন্তর্দর্শন", দেশ, (২৩.০১.১৯৯৯), ৮৯-৯০